BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

মুনাফিক সমাচার

-মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ

'মুনাফিক' শব্দটির উৎপত্তি 'নাফাক' শব্দ থেকে। নাফাক বলা হয় এমন গর্তকে, যা মাটির ভিতর দিয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গিয়েছে এবং যার দুইদিকের দুইটি মুখ খোলা রয়েছে। ইঁদুর যে গর্তে বাসা বাঁধে, তার দুটি মুখই থাকে উন্মুক্ত। একদিক দিয়ে তাড়া করলে অপর দিক দিয়ে সে অতি সহজেই পালিয়ে যেতে পারে এবং শিকারীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। এ জন্যে এ ধরনের গর্তকে আরবীতে বলা হয় নাফেকাউন বা নুফাকাতুন। এই দৃষ্টিতেই দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করাকে কুরআনের পরিভাষায় বলা হয় নিফাক বা মুনাফিকী। আর মুনাফিক বলা হয় তাকে, যার অন্তরের ভাবধারা ও বাহ্যিক প্রকাশ এবং কথা ও কাজে কোনই মিল নেই এবং এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে বৈপরীত্য। (অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলামঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম) ভিতরের স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়ে বাইরে নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান বলে প্রকাশ করা কিংবা কারো প্রতি অন্তরে শত্রুতা রেখে বাইরে বন্ধুত্বের ভান করা এই মুনাফেকী নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। তবে প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে এ ধরনের পলিসি অবলম্বন করে। এককথায়, যারা মুখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে, কিন্তু অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে অথবা আল্লাহর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তারাই মুনাফিক। এই মুনাফিকদের সম্পর্কে আল-কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাও রয়েছে। সূরাটির শানে নুযূল প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পর মুরাইসী কুপের কাছে একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে যখন মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের উপক্রম হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের হস্তক্ষেপে তা মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ ঘটনাকে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল এবং এক মজলিসে আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলল, "তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনাআপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দেবে।" হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজেলোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।" তখন ইবনে উবাই ওযর পেশ করে বলল, "আমি তো কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।" যায়েদ (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) কাছে এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আনসাররা সবাই যায়েদকে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রাঃ) বললেন, "আল্লাহর কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করতাম।" হযরত উমর (রাঃ) ইবনে উবাইকে হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, "যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাজির করব। সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশঙ্কা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে যদি তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখে হয়ত আত্মসম্বরন করতে পারব না। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।" মুসলমানদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও মতবিরোধের প্রেক্ষিতে তাদের মনোযোগকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সফর শুরু করার ঘোষণা দেন। সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন, "তুমি কি বাস্তবেই এরূপ কথা বলেছ?" সে অনেক কসম খেয়ে বলল, "আমি কখনো এরূপ কথা বলিনি। এই বালক মিথ্যাবাদী।" তখন ইবনে উবাইয়ের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল বলে জনগণের মধ্যে যায়েদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার তীব্র হয়ে ওঠে এবং তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। তিনি সফর চলাকালে বার বার রাসূলের (সাঃ) কাছে আসতেন এবং ওহী নাযিলের প্রতীক্ষায় থাকতেন। অবশেষে একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও যায়েদের (রাঃ) সওয়ারী পাশাপাশি যাবার সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদের কান ধরলেন এবং বললেনঃ হে বালক, তোমার কান ঠিকই শুনেছে। আল্লাহ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকূন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।" আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বোঝে না। আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যখন তারা কথা বলে, তখন তা আপনার কাছে শ্রুতিমধুর লাগে। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে

নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। তারাই বলে, "আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনাআপনি সরে যাবে।" নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহরই হাতে কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। তারা বলে, "আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সম্মানিতরা অবশ্যই লাঞ্ছিতদের বহিস্কার করবে।" ইজ্জত তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে, "হে আমার রব, আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

১ম আয়াতে মুনাফিকদের মিথ্যাবাদিতার কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকরা যে নবীজীকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের কথাটা অবশ্যই সত্য; কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী হবার কারণ হল, তারা মুখে আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করার দাবি করলেও অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে। এ থেকে বোঝা গেল যে, মিথ্যাবাদিতা মূলত দুই প্রকার। এক হলো যদি ভাল ও সত্য কথাই মুখে উচ্চারণ করা হয় কিন্তু অন্তরে তার বিপরীত মনোভাব রাখা হয়, অপরটি হলো যদি সরাসরি মন্দ ও মিথ্যা কথাই বলা হয়। মুনাফিকরা আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কখনো মুখে সুন্দর ও ইতিবাচক কথা বলে, কিন্তু অন্তরে কুৎসিত ও নেতিবাচক মনোভাব গোপন রাখে; আবার কখনো মুখেই অশোভন ও নেতিবাচক কথা প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে প্রথমটি হল নিজের ব্যাপারে মিথ্যা বলা, আর দ্বিতীয়টি হল যার সম্পর্কে বলছে তার ব্যাপারে মিথ্যা বলা। মূলত মিথ্যাচারই হচ্ছে মুনাফিকদের প্রধান অবলম্বন। তারা মিথ্যাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এমন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারে যে, তার মধ্যে কোন ফাঁক বের করাটাই মুশকিল হয়ে দাড়ায়। মা আয়েশার (রাঃ) নামে ইবনে উবাই যে অপবাদ রচনা করেছিল, তাতে কয়েকজন বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্ণনাভঙ্গি কতখানি নিপুণ হলে মানুষ এ ধরনের কথা বিশ্বাস করতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। ২য় আয়াতে বলা হয়েছে, "তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে।" অর্থাৎ, তারা অন্তরের কুফর ও নিফাক, মৌখিক কুফরী ও অশ্লীল বাক্য এবং জুলুম-অত্যাচার ও অপরাধমূলক কার্যকলাপের কথা ঢেকে রাখার জন্য শপথ নিয়ে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা চালায়। তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার জন্য যেসব কর্মপন্থা নির্ধারণ করে, মানুষের কাছে সেগুলোর জন্য ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য বা কারণ ব্যক্ত করে এবং তাদের সে ওজরকে প্রমাণ করার জন্য শপথ বাক্যের আশ্রয় নেয়। এছাড়া আল্লাহর দোহাই দিয়ে মানুষের কাছে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য অর্জনের পর সেই আনুগত্যকে পুঁজি করে নিজের অনুগত মানুষকে আল্লাহর পথের বিপরীতে পরিচালিত করাও মুনাফিকদের এক কূটকৌশল। আল্লাহর পথে বাধাদান সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল।" (সূরা আরাফঃ৪৫) অবশ্য এখানে বলা হয়েছে কাফেরদের কথা, যারা প্রকাশ্যে আল্লাহর পথের বিরোধিতা করে, আল্লাহর দ্বীনের মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিষ্কার করে মানুষকে এর প্রতি নিরুৎসাহিত করে। আর মুনাফিকরা নিজেরা আল্লাহর পথে থাকার ভান করে এ পথে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের জন্য কঠিন করে তুলতে চায়, যাতে মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে আপনাআপনি আল্লাহর পথ থেকে সরে যায়। মদীনার মুনাফিকরা শপথকে আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত, আর বর্তমানকালের মুনাফিকরা আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করে। যেখানে খোদ মার্কিন মুল্লুকেও কেবল নিজের আত্মরক্ষার জন্য শপথ নিয়ে মিথ্যা কথা বলার কারণে প্রেসিডেন্টকে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে মুসলিম সমাজে মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা আল্লাহর পথে বাধাদান ও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে মিথ্যা বলার পরেও সহজে পার পেয়ে যায়। মুনাফিকরা যেহেতু ঈমানের পরিচয় লাভ করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে কাফের হয়ে গেছে, সত্যের পথের সন্ধান পেয়েও জেনেশুনে মিথ্যার পথকে বেছে নিয়েছে, তাই তাদের হৃদয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণেই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে মিথ্যাচারকে রাজনৈতিক পলিসি হিসেবে গ্রহণ করার মত মন্দ ও ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করা।

৪র্থ আয়াতের শুরুতে মুনাফিকদের দৈহিক সৌন্দর্য্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইনকিলাবের ভাষ্য, "এ আয়াতে মহান আল্লাহ পাক মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসী লোকদের সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন। মুনাফিকদের দেহাকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব মানুষকে চমৎকৃত করে। তাদের কথা শ্রবণেন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয়। তারা মানুষকে দেহসৌষ্ঠব ও চাতুর্যপূর্ণ কথার দ্বারা প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত করে তোলে।" (দৈনিক ইনকিলাবঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর, '৯৭) আসলে মানুষের ধন-সম্পদ, রূপ-সৌন্দর্য্য, শরীর-স্বাস্থ্য, বাগ্মিতা ইত্যাদি সবই আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। যারা ঈমানে উন্নতি লাভ করে, তাদেরকে আল্লাহ এসব দিয়ে ইমপ্রেশন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন, যাতে তারা মানুষকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। আবার যারা কুফর ও মুনাফেকীতে উন্নতি লাভ করে, তাদেরকেও আল্লাহ এসব দিয়ে ইমপ্রেশন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন, যাতে তারা মানুষকে মিথ্যার দিকে আকর্ষণ করতে পারে। এখন সাধারণ মানুষ কার দিকে আকৃষ্ট হবে, কার ডাকে সাড়া দেবে, সেটা তাদের ব্যাপার। তবে ঈমানদারদের চেহারার নুরানী জ্যোতি আর বেঈমানদের রূপ-সৌন্দর্য এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এ আয়াতে মুনাফিকদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যেক শোরগোলকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। ইবনে উবাই যে নিছক ছেলেপেলের ঝগড়াকে গোত্রীয় বিবাদে রূপ দিতে চেয়েছিল এবং এটাকে তার নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের শত্রুতা ও চক্রান্ত হিসেবে দেখাতে চেয়েছিল, আয়াতে মূলত সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আজও দেখা যায়, কোন পরিবারে বাচ্চাদের মধ্যে ঝগড়া হলে এমনকি খেলতে গিয়ে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটলেও মুনাফিকরা সেটাকে নিজেদের উপর আঘাত হিসেবে জাহির করে। তাদের সন্তানদেরকে কেউ কোন ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য নির্দোষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তারা তার মধ্যে নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আবিষ্কার করে এবং এটাকে তাদের প্রতি বৈষম্য ও পক্ষপাত হিসেবে দেখাতে চায়। বিশেষ করে যারা ইসলামবিদ্বেষী মুনাফিক, তাদের সন্তানদেরকে কেউ ধর্মকর্মের

প্রতি উদ্বুদ্ধ করলে সেটাকে তারা তাদের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান এবং তাদেরকে জব্দ করার প্রয়াস বলে মনে করে, তাদের বিরুদ্ধে টেক্কা মারার মনোভাব কারো থাকুক বা না থাকুক। জাতীয় পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই, কোন মাদ্রাসায় অ্যাসেম্বলী হতে দেখলে মুনাফিকরা সেটাকে সামরিক প্রশিক্ষণ মনে করে, তালেবান তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে। সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য কোন অভিযান চালানো হলে সেটাকে তারা তাদের বিরুদ্ধে দমননীতি হিসেবে গণ্য করে এবং পেরেশান হয়ে ওঠে। তাদের বিদেশী প্রভুরা কোন মুসলিম দেশে ঘরের চাল কিংবা ওষুধের কারখানা দেখলেও সেটাকে পারমাণবিক স্থাপনা বা রাসায়নিক অস্ত্রের কারখানা সাব্যস্ত করে নির্মমভাবে আঘাত হানে। আসলে মনের ভিতর অপরাধপ্রবণতা থাকলে কোথাও সামান্য হৈ চৈ দেখলেই সন্দেহ হয় যে, মানুষ আমার অপরাধের কথা জেনে ফেলল কিনা বা আমার অপরাধের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠছে কিনা। চোরের মনে পুলিশ পুলিশই বটে। মুনাফিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ বা শোরগোল হয় না তা নয়, কিন্তু তারা প্রত্যেক শোরগোলকেই নিজেদের বিপক্ষে মনে করে। আয়াতে এরপর বলা হয়েছে, "তারাই শত্রু, অতএব তাদের থেকে সতর্ক হোন।" উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদেরকে তো মুসলমানরা শত্রু হিসেবেই জানে, তাই তাদের শত্রুতার উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানের বেশধারী মুনাফিকদের চেনা আমাদের পক্ষে কঠিন হওয়ায় আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সাবধান করেছেন। কাফেরদের চেহারা-সুরত ও কথাবার্তাই শত্রুতার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু মুনাফিকদের চেহারা ও কথাবার্তা আকর্ষণীয় হওয়ায় তাদের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা আবশ্যক। প্রকাশ্য শত্রু কাফেরদের আক্রমণ ও নির্যাতন মোকাবেলা করা সহজ, কিন্তু গোপন শত্রু মুনাফিকদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতাকে সামাল দেয়া বড়ই দুষ্কর। কাফেররা তো সরাসরি বোমা মেরে বা গান পাউডার ছিটিয়ে মুসলমানদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু মুসলমানদের ঘরবাড়িতে লুকিয়ে থাকা মুনাফিকরা ঘরের নিচে এমনভাবে ডিনামাইট পুঁতে রাখতে পারে যা কেউ টেরও পাবে না। বাইরের শত্রু কাফেররা যেখানে হাত-পা বেঁধে ঘাড় ধরে মুসলমানদের আগুনে নিক্ষেপ করে, সেখানে ঘরের শত্রু মুনাফিকরা মুসলমানদের ঘরের মধ্যেই কৌশলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে তারপর সেবক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আত্মস্বীকৃত কাফেররা নির্যাতিত মুসলমানদের আর্তচিৎকার দেখে প্রকাশ্যে অট্টহাসিতে মেতে উঠলেও মুসলিমবেশী মুনাফিকরা মুসলমানদের কান্নায় নিজেরাও শরীক হয়, চোখ দিয়ে অশ্রু বের করে। প্রকাশ্য শত্রুর হাতে মার খেয়ে শত্রুকে ভালভাবে চেনা যায়, হাত দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়, অথবা মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করা যায়, আর তা না পারলেও অন্তত মনে মনে ঘৃণা করা যায়। কিন্তু বন্ধুবেশী শত্রুর দ্বারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ঘৃণা বা শত্রুতা করার সুযোগ থাকে না, বরং ভালবাসতে হয়। এরা হাসের পালক এমনভাবে উৎপাটন করে যেন সে টেরও না পায়। এককথায়, আত্মস্বীকৃত কাফেররা যেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা করে, সেখানে মুসলিম বেশধারী মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ সাধনের নামে গোপন শত্রুতা চরিতার্থ করে। অতএব, মুনাফিকদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চেহারা সুরত যত আকর্ষণীয় হোক না কেন, তাদের দিকে এতটুকু ঝুঁকে পড়া চলবে না, বরং তাদেরকে শত্রু হিসেবেই গণ্য করতে হবে এবং তাদের শত্রুতার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কারণ, দুর্জন সুদর্শন হলেও পরিত্যাজ্য।

৫ম আয়াতে মুনাফিকদের একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে উবাইয়ের মুনাফেকি সম্পর্কে আয়াত নাযিলের পর তার হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে উপদেশ দিল যে, তুই জানিস কুরআনে তোর সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল, "তোমরা আমাকে ঈমান আনতে বলেছিলে, আমি ঈমান এনেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকি রইল? আমি কি মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সেজদা করব?" আয়াতে তার এ আচরণের জন্য তার অহংকারকে দায়ী করা হয়েছে। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন সে তার পাপপ্রসূত অহংকারকে আঁকড়ে ধরে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা।" (সূরা বাকারাঃ২০৬) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "অনুতাপে পাপ খণ্ডায়, আর অহংকারে পুণ্য খণ্ডায়।" যেখানে নেকী নিয়ে অহংকার করলেই তা নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে অহংকারটা যদি পাপ নিয়ে করা হয়, তবে সেই পাপ বহুগুণ বেড়ে যায়। আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-নিষেধ এবং মুসলমানদের বাদ-প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পাপের পথে অটল থাকতে পারাকে মুনাফিকরা নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে। তারা নিজেরা যেহেতু অনুতপ্ত হয়নি, ক্ষমাপ্রার্থনা করেনি, তাই তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও কোন কাজ হবে না। ইবলীস যেমন ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে নিজের অবাধ্যতাকেই আঁকড়ে ধরেছিল, অন্যায়ের পক্ষেই অহংকার করেছিল, তাই সে ক্ষমা পায়নি, বরং অভিশপ্ত হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ কোন মিথ্যাবাদী কাফেরকে হেদায়েত করেন না।"

৭ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা রাসূলের (সাঃ) সঙ্গী-সাথীদের জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে। ইবনে উবাই যে আনসারদের কাছে মুহাজিরদের প্রতি সাহায্য বন্ধের আহবান জানিয়েছিল, এখানে সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করাতে মুনাফিকরা সর্বদাই তৎপর। কখনো শত্রুতা ও ভুল-বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে, আবার কখনো সম্পদ ফুরিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে তারা আমাদের হাতের মুঠোকে বন্ধ রাখতে চায়। যেকোন ধরনের দানশীলতাকে তারা বোকামি বলে প্রচার করে। আসল কথা হল, মুসলমানদের পারস্পরিক ত্যাগ ও ভালবাসা মুনাফিকের জন্য হিংসার কারণ। এমনকি কোন মুসলমান যদি একটা আপেল একা না খেয়ে অপর কোন ভাই-বোনের সাথে ভাগাভাগি করে খায়, তাহলে তাদের এ সামান্য মিল-মহব্বতটুকুও শত্রুপক্ষ সুনজরে দেখতে পারে না। তুমি সামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের ভালবাসা অর্জন করবে, এটা মেনে নিতে ব্যর্থ হওয়াটাই শয়তানের পক্ষে স্বাভাবিক। যে তোমাকে মুসলিম ভাই-বোনদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়, যে তোমাকে সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র বানাতে চায়; সে আর যাই হোক-- তোমার আপনজন হতে পারে না। কোথাও যদি মুসলমানদের বসনিয়ার জন্য দশ টাকা করে চাঁদা দিতে দেখা যায়, সেটাও মুনাফিকদের সহ্য হয় না। তাদের মুখে তখন শোনা যায়ঃ দেশের মানুষই খেতে পায় না, আর বিদেশের জন্য সাহায্য দেয়া হচ্ছে। অথচ এরাই নানা অভিনব কৌশলে দেশের মানুষকে শোষণ করে, সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত করে। এরা আমাদের অপচয় রোধের নামে বর্জ্য ভক্ষণ করায়, আর

ভাল খাবারটুকু ফেলে দেয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইবনে উবাইয়ের উক্তির জবাব দেয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। তারা মানুষের কাছে তদবির করে সাহায্য বন্ধ করাতে পারে, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতকে বন্ধ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। "যে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনোই দুনিয়া ও আখেরাতে রাসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা।" (সূরা হজ্জঃ১৫) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছাতেই পারবে না, তদবির করা বা চাপ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা। আর গায়ের জোরে আল্লাহ ও বান্দার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কথা তো তারা কল্পনাও করতে পারবে না। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুনাফিকরা প্রথমে একজনের উপর প্ররোচনা বা চাপ দিয়ে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তারপর দ্বিতীয়জন যখন এর প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা দুর্ব্যবহার করবে, তখন আর কাউকে উস্কানী দেয়ারও প্রয়োজন পড়বে না, বরং তারা উভয়ে আপনাআপনি পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। মুনাফিক ব্যক্তি তখন নিজে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত সেজে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যেই একজনকে দায়ী করতে পারবে, আরেকজনের প্রতি দরদ দেখাতে পারবে, আর নিজেকে শান্তিপ্রিয়, মীমাংসাকারী ও ত্রাণকর্তা হিসেবেও জাহির করতে পারবে। মুনাফিকরা নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদের অহংকারে নিজেদেরকে মুসলমানদের তুলনায় অধিক সম্মানিত মনে করে আর মুসলমানদের মনে করে লাঞ্ছিত। তাই আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, সম্মান কেবল আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ স্বয়ং মান-সম্মানের মালিক এবং তিনি তাঁর রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদের মান-সম্মান দান করেন। মুনাফিকরা নিজেদেরকে যেমন মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তেমনি কাফেরদেরকে নিজেদের চেয়ে অধিক সম্মানিত মনে করে এবং তাদের সান্নিধ্যকেই নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির উপায় বলে গণ্য করে। কারণ, কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থ-সম্পদ মুনাফিকদের তুলনায় বেশী। এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "যারা ঈমানদারদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে ইজ্জত খোঁজে? অথচ সমস্ত ইজ্জতের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ।" (সূরা নিসাঃ১৩৯) ইবনে উবাই যেহেতু নিজেকে শক্তিশালী ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবীদের দুর্বল ও হেয় বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য আনসারদেরকে উত্তেজিত করেছিল, তাই আল্লাহ তাআলা এর জবাবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযতওয়ালারা হেয় লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কারণ, মুসলমানরা কেউ মান-সম্মানের জন্য তোমাদের মুখাপেক্ষী নয়, বরং আল্লাহই তাঁর ঈমানদার বান্দাদের সাহায্য করে শক্তিশালী ও সম্মানিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। মদীনার সেই মুনাফিক নেতা মূলত গোত্রীয় চেতনাকে পুঁজি করেই নিজ গোত্রকে মর্যাদাবান আর অপর গোত্রকে হীন সাব্যস্ত করেছিল। তার এই ন্যাকারজনক ভূমিকা আর উস্কানীমূলক কার্যকলাপ এবং তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে দেশ-ভাষা, গোত্র-সম্প্রদায়, আঞ্চলিকতা আর জাতিগত বিভক্তির নামে বিভেদ ও হানাহানির সৃষ্টি করা, কেবলমাত্র বর্ণ-গোত্রের ভিত্তিতে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ আর অন্যদেরকে হেয়জ্ঞান করা এবং জাতিগত ভিন্নতার দোহাই দিয়ে কোন মুসলমানকে পরিত্যাগ করতে বলা মূলত মুনাফিক নেতাদেরই কাজ, যারা মুসলিম উম্মাহর হিতাকাংক্ষী নয়, বরং ইসলাম ও মুসলমানের কট্টর দুশমন।

সূরা মুনাফিকূনের ৯ম আয়াতে আল্লাহ আমাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন যে, আমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। আসলে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি মানুষের দুর্বলতাকে মুনাফিকরা বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। যারা আমাদের গরীব বানিয়ে রাখার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করে না, তারাই আমাদের ধন-সম্পদের জন্য বিবাদে লিপ্ত হবার প্ররোচনা যোগায়, অপরের পরিশ্রমের ফসল নিজের ঘরে তোলার জন্য লালায়িত করে তোলে। এভাবে তারা ধন-সম্পদের দ্বারা বিভেদ সৃষ্টি করে। মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ কেড়ে নেয়ার জন্য হোক বা কাফের দুশমনের কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্য হোক, টাকার লোভই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের মূল কারণ। অর্থ-সম্পদ তথা দুনিয়াবি স্বার্থের ফাঁদে পা দিলে ইসলামী মুজাহিদরাও পরিণত হতে পারে বিশ্বাসঘাতক মুনাফিকে। আর সন্তান-সন্ততির দ্বারা যেভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা হয় তাহল-- মুনাফিকরা প্রথমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মারামারি লাগায়, তারপর একে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট পিতামাতাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার প্রয়াস পায়। আনসার ও মুহাজির বালকদ্বয়ের বিবাদকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে যুদ্ধ লাগার উপক্রম হয়েছিল, তার মূলেও ছিল এই স্বজনপ্রীতির মনোভাব। আমরা যদি নিজের ও অপরের সকলের সন্তানদের সমান দৃষ্টিতে দেখতে পারি এবং সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ তথা দ্বীন কায়েমের ব্যাপারকে অগ্রাধিকার দিতে পারি, তবেই মুনাফিকদের চক্রান্ত মাঠে মারা যাবে। আমার সন্তানদের প্রতি আবেগ যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারি, তাহলে যে কেউ যে কারো নামে আমার সন্তানদের কুৎসা গাওয়ার অভিযোগ এনে আমাকে উত্তেজিত করতে পারবে। আমরা যদি মুনাফিকদের কথামত টাকার জন্য মুসলিম ভাইদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হই, তাহলে আমরা নিজেরা যেমন মুসলিম ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব, তেমনি আমাদের সন্তানরাও মানুষের সহানুভূতি হারাবে। শুধুমাত্র নিজে কয়েকটি টাকা বেশি পাওয়ার জন্য অপরের শান্তি কেড়ে নেয়া এবং সেই সাথে নিজেকে ও নিজের সন্তানদেরকে অন্যান্য মুসলমানের শত্রুতার সম্মুখীন করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এতে করে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু মুনাফিকের হাতকেই শক্তিশালী করা হয় এবং যে ব্যক্তি জেনেশুনে এভাবে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে বিভেদের কারণ সৃষ্টি করবে আর আল্লাহর দুশমনের হাতকে শক্তিশালী করবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনোই সম্পদশালী করবেন না। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত ইসলামে নিন্দনীয় নয়, কেবল তাদের মহব্বতে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া নিন্দনীয়। "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের পরিবার-পরিজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর; আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (সূরা তওবাঃ২৪) আল্লাহ আমাদের আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। অর্থাৎ, আমরা যদি নিজের ও পরিবার-পরিজনের

পার্থিব স্বার্থকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীনের কল্যাণের উপরে অগ্রাধিকার দেই, তাহলে একদিকে যেমন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হবে, অপরদিকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতেও কোন বরকত পাওয়া যাবে না। উদাহরণসরূপ, আমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের কারণে আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত থাকি, তাহলে শত্রুরা সহজেই এগিয়ে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের ফ্রন্টলাইন আমাদের ঘরের দরজা পর্যন্ত প্রসারিত হবে। ফলে সবাইকে মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে সহ পরপারে পাড়ি জমাতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, মানুষের নিজের পরিবার ও দেশ ছেড়ে অন্য দেশের মানুষের জন্য কাজ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা। এর জবাব হল, এক্ষেত্রে নিজের বা পরের দেশ ব্যাপার নয়, ব্যাপার হল আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থ। যেখানে মানুষের ঈমান ও জীবন বিপন্ন হয়, যেখানে মানুষ আল্লাহর এবাদত করতে বাধার সম্মুখীন হয়, সেখানে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়াটাই ইনসাফের দাবি। আল্লাহ আমাদের শখের কাজ ও শৌখিন প্রয়োজনের তুলনায় জরুরী প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন, এর অর্থ নিজের সন্তানদের তুলনায় পরের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেয়া নয়। অবশ্য কেউ জিহাদে গেলে যদি তার পিতামাতা বা সন্তান-সন্ততির বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। যে মুসলমানের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়ার কথা, সেই মুসলমান আজ সামান্য টাকার লোভে মুসলিম ভাইয়ের মোকাবেলায় শত্রু সৈন্যদের পথ পরিষ্কার করতে মাইন বিস্ফোরণে প্রাণ বিসর্জন দেয় প্রভুভক্ত কুকুরের মত। টাকার নেশায় অন্ধ হবার ফলে আমাদের এ কথাটিও ভেবে দেখার ফুরসত হয় না যে, ওদের কাছে আমরা যে টাকা পাই, তারা তা নিজেদের পকেট থেকে দেয় না, বরং এক মুসলমানের কাছ থেকে নিয়ে অপর মুসলমানকে দেয়, সার্ভিসটা কেবল নিজেরা পায়। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হবার ফলেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে আল্লাহর দুশমনদের সাহায্য করতে রাজি হওয়া। তাই তো সন্তানের জন্য টাকা কামাই করতে গিয়ে সন্তানকেই এতিম বানাতে হয়। এ যে কত বড় ক্ষতি তা বলাই বাহুল্য। "বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (সূরা যুমার) সম্পদ ও সন্তানদের জন্য জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকলে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, তেমনি সন্তানের জন্য অর্থ উপার্জন করতে যদি সন্তানকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দূরে যাওয়া হয়, তাহলে নিজেকে যেমন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল রাখতে হবে, তেমনি সন্তানের ঈমান ও জীবন শত্রুর দ্বারা বিপন্ন হবে। টাকা কামাতে পারলেও তা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, বরং শত্রুর হাতই শক্তিশালী হবে। তখন তোমার টাকা দিয়েই তোমার সন্তানকে মারা হবে, মাছের তেলেই মাছ ভাজা হবে। আমাদের আম-ছালা সবই যাবে। মুনাফিকরা চায় আমরা যেন টাকার মোহে কখনো বাইরে ছুটে বেড়াই যাতে তারা সেই সুযোগে ঘরে আমাদের সন্তানদের সর্বনাশ করতে পারে, আবার কখনো টাকা ও সন্তান উভয় জিনিসের মায়ায় ঘরমুখী হয়ে পড়ি যাতে সেই সুযোগে তাদের কাফের প্রভুরা বাইরের মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারে। অতএব, আমরা ঘরে-বাইরে যখন যেখানেই থাকি না কেন, সর্বাবস্থায় আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নিজের ও অপরের দ্বীনী কল্যাণ সাধনেই ব্যাপৃত থাকা উচিত। যখনই আমরা দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে নিছক টাকা কামাইয়ের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব, তখনই আমরা পিছিয়ে পড়ব এবং কাফের-মুনাফিকরা এগিয়ে যাবে। ধন-সম্পদের বেলায় আমাদের কর্তব্য হল একে নিজের ও পরিবারের কল্যাণের পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণেও ব্যবহার করতে হবে; আর সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় হল তাদেরকে আদর-যত্নের সাথে লালন-পালনের পাশাপাশি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সৈনিকরূপে গড়ে তুলতে হবে, জাগতিক সম্পদ ও সম্মান অর্জনের তুলনায় ঈমানী সম্পদ ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রতি অধিক উৎসাহ দিতে হবে। মোটকথা, আমাদের সন্তান-সন্ততি যেন ব্যক্তিগত এবাদত-বন্দেগি থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পর্যন্ত কোন পর্যায়েই আল্লাহর হুকুম পালনে অন্তরায় না হয়। নিজের ও পরিবার-পরিজনের শৌখিন ভোগবিলাসের জন্য যেন অন্যদের মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কে গাফেল না হই, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিজের স্বার্থের জন্য মানুষের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া ঈমানদারদের কাজ নয়, বরং মুনাফিকদের কাজ। মুনাফিকরা মূলত ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও জৈবিক চাহিদার জন্যই ঈমান হারিয়ে মুনাফিক হয়েছে। স্বার্থ নিয়ে সংঘাত দুইভাবে হতে পারে; তাহল বৈধ বা অবৈধ একই স্বার্থ নিয়ে যদি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়; অথবা কেউ যদি অবৈধ স্বার্থ অর্জনের জন্য মানুষের বৈধ অধিকার কেড়ে নিতে চায় বা অবৈধ লালসা পূরণের জন্য অশ্লীল ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তখন সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য হোক অথবা ইসলাম, ন্যায়নীতি ও সামাজিক পবিত্রতার খাতিরে হোক রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। তখন সেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি মানুষের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তার কার্যকলাপ যেহেতু কেবল মানুষের দ্বারাই বাধাপ্রাপ্ত হয় না বরং ইসলামের দ্বারাও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, সেহেতু ইসলামের সাথেও তার বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং এভাবে সে পরিণত হয় ইসলামবিরোধী মুনাফিকে। ইসলামের সাথে শত্রুতার সূচনাটা স্বার্থের জন্য হলেও প্রতিহিংসা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন নিজের স্বার্থের পরিবর্তে ইসলামের বিরোধিতা করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য ও জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। সে তখন ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের জন্য নিজের স্বার্থ এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.) লিখেছেন, "প্রকৃতপক্ষে মানুষের গোটা জীবনই একটা বিশেষ পরীক্ষার স্থল। আল্লাহর দেয়া মাল, সম্পদ, সম্পত্তি আর সন্তান-- পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে এ দুটো প্রধান। এ পরীক্ষায় তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা এক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকে সুষম ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির একটি দিক হচ্ছে এই যে, তার প্রতি প্রেম-ভালবাসা ও দরদ মায়া আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য বোধকেও ছাড়িয়ে যাবে এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। পআন্তরে বাড়াবাড়ির অপর দিকটি হচ্ছে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার, স্নেহ-বাৎসল্য প্রদর্শন ও তাদের হক আদায় করার পরিবর্তে তাদের প্রতি অমানুষিক জুলুম করা, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যান করা। কুরআন মজীদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই মাল ও আওলাদকে ফেতনা বা পরীক্ষার বিষয় কিংবা দ্বীনী জিন্দেগি যাপনের পথে হুমকিসরূপ বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। জাহিলিয়াতের যুগে এ সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অবলম্বিত হতো না। একদিকের বাড়াবাড়ি ছিল-- সন্তান হত্যা করতেও সেকালের লোকেরা কুণ্ঠিত হতো না। আর অপরদিকের বাড়াবাড়ি এই ছিল যে, সন্তান সংখ্যার বিপুলতা নিয়ে তারা পারস্পরিক গৌরব ও জনশক্তির ফখর করতো, শক্তির দাপট আর ধমক দেখাতো, আভিজাত্যের অহংকারে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত।" (পরিবার ও পারিবারিক

জীবন) আমার মতে, একই মানুষের মধ্যে এ দুটি পরস্পরবিরোধী স্বভাব থাকা অসম্ভব নয়। একই ব্যক্তি তার একই সন্তানদের নিয়ে একই সাথে গর্বও করতে পারে, আবার তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণও করতে পারে। মানুষের কাছে গর্ব করার মত উপাদান সন্তানদের মাঝে পয়দা করার জন্য তারা সন্তানদের প্রতি এরূপ আচরণ করতে বাধ্য হয়। কেবল নিজের ব্যক্তিগত অহংকার প্রদর্শন করাই এসব মানুষের লক্ষ্য, সন্তানদের প্রতি কোন প্রকৃত ভালবাসা এদের নেই বললেই চলে। বিশেষত যারা ইসলামের বিরোধিতা করাকেই গর্বের বিষয় তথা মর্যাদার মাপকাঠি মনে করে, তারা নিজ নিজ সন্তানকে ইসলামবিরোধীরূপে গড়ে তুলতেই সচেষ্ট হয় এবং সন্তানের মধ্যকার ইসলামী চেতনাকে দমন করার জন্য যেকোন ধরনের নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ পন্থা প্রয়োগে কুণ্ঠিত হয় না। যারা চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সামান্য ব্যবধান দেখলেই উত্তেজিত হয়, ধন-সম্পদের পূর্ণতা এবং সন্তানদের আনুগত্য ও সফলতা পুরোপুরি পাওয়ার পরও মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভুল-ত্রুটি ও ঘাটতি বের করে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তারাই জান-মালে বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার চেয়েও মারাত্মক বিষয় হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ নেতিবাচকভাবে করা। মানুষ অনেক সময় সন্তান-সন্ততির বিপদ দেখলে আল্লাহর উপর বিরক্তি প্রকাশ করে। এমনটি যারা করে তারা আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। একদল হল সন্তানের মহব্বতের আতিশয্যে সন্তানের দুঃখ দেখলে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত হয় এবং আল্লাহর প্রতি বিরক্ত হয়; আরেকদল হচ্ছে সন্তানের দুঃখ-কষ্টে আসলে তেমন কোন ব্যথা অনুভব করে না, বরং আপন সন্তানের দুঃখ-কষ্টকে আল্লাহর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে। দ্বিতীয় দলটি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই, তবে প্রথম দলটিকে আমরা আল্লাহর আয়াতের দিকে লক্ষ্য করে সবর ও তাওয়াক্কুল অবলম্বনের আহবান জানাতে পারি।

আলোচ্য সূরার শেষের দুই আয়াতে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আমরা যেন সময় থাকতে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করি। ঈমান, তওবা, সৎকর্ম, দান-খয়রাত ইত্যাদি সবকিছুই কবুল হবার সময় হচ্ছে মৃত্যুকষ্ট শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত। আল্লাহ আমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে সময় থাকতে ব্যয় না করে যদি মৃত্যুর পূর্বে দান করার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাহলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। অনুরূপভাবে, ফরজ-ওয়াজিব এবাদত ও যাবতীয় সৎকর্ম যদি না করি, তাহলে মৃত্যুশয্যায় আল্লাহর কাছে সুযোগ চেয়ে লাভ হবে না। শক্তি-সামর্থ্য থাকা অবস্থায় যদি পাপ থেকে তওবা না করি, তাহলে দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় তওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সর্বোপরি যারা ঈমান আনেনি, কাফের বা মুনাফিক অবস্থায় আছে, তারাও যদি ভালোয় ভালোয় ঈমান না আনে, তাহলে মরণকালে ফেরাউনের মত ঈমান আনলে কোন ফায়দা হবে না। শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত পরিতাপ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আর কাউকে অবকাশ দেয়া হবে না। অতএব, এ সীমিত সময়ে যারা আল্লাহর আনুগত্য, ঈমান, সৎকর্ম ও দানশীলতার পরিচয় দেবে, তারাই মুক্তি পাবে; আর যারা আল্লাহদ্রোহিতা, কুফর, নিফাক, অসৎকর্ম ও কৃপণতার পরিচয় দেবে, তারাই চির ভোগান্তির শিকার হবে। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলা হয়েছে, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। আর এমন লোকদের জন্য কোন তওবা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" (নিসাঃ১৭,১৮) "যারা রবের আদেশ পালন করে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণসরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান।" (সূরা রা'দঃ১৮) অতএব, যখন দুনিয়া জোড়া সম্পদ ব্যয় করলেও নাজাত পাওয়া যাবে না সেই নির্দিষ্ট সময় আসার আগেই এমন সময় থাকতে ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ, যখন আন্তরিকতার সাথে কৃত সামান্য অর্থব্যয়ও ভবিষ্যতে নাজাতের নিশ্চয়তা এনে দিতে পারে। মানুষের জাহান্নামী হবার কারণ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "(জান্নাতীরা) বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না।" (সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ৪২-৪৪) জাহান্নাম থেকে নাজাতের উপায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "এ থেকে দূরে রাখা হবে মুত্তাকী ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে। এবং তার উপর কারো কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। তার মহান রবের সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।" (সূরা লাইলঃ১৮-২০) যারা আল্লাহর পথে ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে ব্যয় করতে অস্বীকার করে, তারাই যেখানে জাহান্নামের শিকার হবে, সেখানে যারা আল্লাহদ্রোহিতা এবং ইসলাম ও মানবতার অকল্যাণ সাধনের কাজে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে, তাদের অবস্থা কি হবে তা বলাই বাহুল্য। মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা, "ওয়াদা করেছেন আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের-- সেখানে তারা চিরদিন পড়ে থাকবে। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি লানত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।" (সূরা তাওবাহঃ৬৮) মুনাফিকদের জাহান্নামী হবার কথা তো জানতে পারলাম, এবার দেখা যাক জাহান্নামে তারা কি কি শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাদের শাস্তির সূত্রপাত হবে মৃত্যুর সময় থেকেই। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "আর যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন ফেরেশতারা কাফেরদের প্রাণ হরণ করে নেয়, তখন তাদের চেহারা ও পিঠে মারতে থাকে আর বলে, তোমরা দহন শাস্তি আস্বাদন কর। এটা সেই কারণে যা তোমাদের হস্ত অগ্রগামী করেছিল; আর আল্লাহ অবশ্যই বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন।" (সূরা আনফালঃ৫০) আর যখন জাহান্নামে দাখিল হবে, তখন তাদের শাস্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে। তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা কোন শীতল বা পানীয় আস্বাদন করবে না, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত।" (সূরা নাবাঃ২৪,২৫) তারা খেতে না চাইলেও জোর করে গিলিয়ে দেয়া হবে। কষ্টের চোটে বমি করে দিলেও তা আবার পুশব্যাক করা হবে। কারণ, দুনিয়াতে যে যেভাবে জুলুম করেছে, আখেরাতে সে সেই একই পদ্ধতিতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কারো উপর জুলুম করা হবে না। এবার দেখা যাক, জাহান্নামে মুনাফিকদের অবস্থান কি হবে। আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা, "নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনো পাবে না। অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে,

BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

তারা থাকবে মুমিনদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন। তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক! আর আল্লাহ হচ্ছে মূল্যদানকার, সর্বজ্ঞ। আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী।" (সূরা নিসাঃ১৪৫-১৪৯) এ আয়াতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থান অনিবার্য এবং এ থেকে কেউ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, "শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে কে আল্লাহর সাথে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে।" (নিসাঃ১০৯) অবশ্য দয়াময় আল্লাহ এদেরকেও তওবার অবকাশ দিয়েছেন। সত্যিই রাব্বুল আলামীনের রহমতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। হাবিয়ায় যাওয়ার জন্য যে পাসপোর্ট-ভিসা কনফার্ম করে ফেলেছে, তাকেও আল্লাহ তাআলা সংশোধন করে ফেরদৌস পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু মুনাফিকরা যদি জেদ করে নিজেদের কুপথে অটল থাকতে চাও, তাহলে জেনে রাখ-- তোমরা জান্নাতে গেলেও আমাদের কোন লাভ নেই, আর তোমরা জাহান্নামে গেলেও আমাদের কোন ক্ষতি নেই। "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম।" (সূরা শূরা) "আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে তার কথা ছাড়া।" মুনাফিকদের পরিণতি আলোচনার পরক্ষণেই এ প্রসঙ্গ অবতারণার তাৎপর্য এই যে, কারো জাহান্নামী হওয়াটা একটা অপ্রীতিকর বিষয় হওয়ায় তা প্রকাশ করা যদিও আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, তথাপি মুনাফিকরা যেহেতু কেবল নিজেরা জাহান্নামের কাজ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং মানুষকেও জোর-জুলুম করে জাহান্নামের দিকে টেনে-হিঁচড়ে নিতে চায়, তাই জুলুম-অত্যাচারের পরিণতি জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে জালেমদের ভীতি প্রদর্শন করা এবং মজলুমদের সান্ত্বনা দান করা দয়াময় আল্লাহর কাছে এক অপরিহার্য বিষয়। মানুষের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি অন্বেষণ করা যতখানি পরিত্যাজ্য, জুলুমের কথা প্রকাশ করা ততখানি অপরিহার্য। মক্কী জীবনে কাফের-মুশরিক এবং মদীনা জীবনে মুনাফিকদের মধ্যে কেবল সেই সমস্ত লোকদের ব্যক্তিগত দোষ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে, যারা রাসূলকে কষ্ট দিত, মানুষের অনিষ্ট করত কিংবা আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলত।

মুনাফিকরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে, ১৪ শতাধিক বছর আগে অবতীর্ণ কুরআন কিভাবে আজও তোমাদের চিহ্নিত করছে। এসব নিদর্শন দেখার পরও কি তোমাদের হুঁশ হবে না? দরিয়ার সমস্ত পানিকে কালি বানালেও তোমাদের কার্যকলাপের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর আদিষ্ট ফেরেশতারাই তোমাদের পরিপূর্ণ আমলনামা লিপিবদ্ধ করতে পারে। তবে আমরা আল্লাহর কিতাবের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করে সেগুলোর আলোকে একটি মিনি আমলনামা তৈরি করে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। হলুদ কার্ড দেখে সাবধান হয়ে যাও, লাল কার্ড যেন দেখতে না হয়। কিয়ামতের দিন চূড়ান্ত আমলনামা দেখা থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। সেদিন কিন্তু খেলা ফাইনাল হয়ে যাবে। যেখানে তোমরা আল্লাহর বান্দাদের কাছেই ধরা পড়ে গেছ, সেখানে আল্লাহর হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাবে ভেবে দেখ।

মুনাফিকদের নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা কেউ হয়ত নিজের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রকাশ্য কাফের হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, কেউ বা তওবা করে ঈমানদার হয়ে যাবে, আবার কেউ হয়ত যেমন আছে তেমনই থাকবে। আবার কেউ কেউ তওবা ও অনুতাপের ভান করে নিত্য নতুন কৌশলে নিজ নিজ তৎপরতা চালিয়ে যাবে।

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ২-৮ আগষ্ট, ২০০০